

1952 সালের ভাষা আন্দোলন

বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন। স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পেছনে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমেই তৎকালীন পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক আন্দোলন সুসংহত ও অগ্রসর হয়। ভাষা আন্দোলনের চেতনাই পরবর্তীতে ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে জনগণের মধ্যে নতুন চেতনা সঞ্চার করে এবং এর মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটে। এই আন্দোলন বাঙালির সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক আকাঙ্ক্ষাকে হাজার গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। তাই '৫২-এর ভাষা আন্দোলন ছিল বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির গণচেতনার প্রথম বহিঃপ্রকাশ এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। স্বাধীন বাংলাদেশের উন্নয়নে ভাষা আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

প্রায় দুইশত বছরের ব্রিটিশদের দুঃশাসন ও অপশাসনের অবসান ঘটিয়ে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতীয় উপমহাদেশে পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। পাকিস্তান একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল এবং ভারত একটি হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে গঠিত হয়েছিল, কিন্তু বাংলাদেশ শুধুমাত্র ধর্মীয় কারণে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। তবে পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের কোনো আদর্শিক যোগসূত্র ছিল না। প্রধান কারণ বলা যায়

দুই অঞ্চলের মধ্যে একটি ভাষাগত দ্বন্দ্ব হতে হবে। ভাষাগত বিরোধের কারণে বাংলার মানুষ কখনোই পাকিস্তানের মৌলিক আদর্শের সাথে ঐক্য অনুভব করতে পারেনি। এ ছাড়া পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব বাংলার জনগণের ওপর বৈষম্যমূলক নীতি আরোপ করা হয়। মূলত এসব কারণেই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই ভাষা আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় এবং ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরে 'তমুদ্দুন মজলিস' নামে একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের মাধ্যমে পূর্ব বাংলায় ভাষা আন্দোলন শুরু হয়। তমুদ্দুন মজলিসের নেতৃত্বে ছিলেন তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ অধ্যাপক আবুল কাশেম। বাংলার দীর্ঘ রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রতিটি ধাপে সেই ভাষা আন্দোলনের প্রভাব দেখা যায়। এর ফলপ্রসূ ফল আজকের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। ইতিহাসের প্রতিটি টুকরো সাক্ষী হতে পারে। এর ফলপ্রসূ ফল আজকের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। ইতিহাসের প্রতিটি টুকরো সাক্ষী হতে পারে। এর ফলপ্রসূ ফল আজকের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট: বাংলা ভাষা আন্দোলনের পেছনে একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রয়েছে। পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মাতৃভাষা বাংলা হলেও পূর্ব বাংলায় সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৭ সালের ২রা সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক-শিক্ষার্থী 'তমুদ্দুন মজলিস' গঠনের মাধ্যমে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাপক আন্দোলন শুরু করেন এবং সেই আন্দোলনের চূড়ান্ত সাফল্য আসে ২১শে ফেব্রুয়ারি। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর বাঙালির ইতিহাস-ঐতিহ্য ও ভাষা-সংস্কৃতি হারিয়ে যেতে বসেছিল। পাকিস্তানি শাসকরা বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি চরম অবজ্ঞা দেখিয়ে সেদিন বাঙালি জাতিকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছিল। এর পরিণতি ছিল ভয়াবহ। পাকিস্তানি নব্য-ঔপনিবেশিক শাসন শুরু থেকেই দেশের নিরীহ জনগণের ওপর নির্যাতনের ধারা অব্যাহত রেখেছে। বাংলার মানুষের কথ্য ভাষা কীভাবে চুরি করা যায় তা ছিল তাদের প্রথম আবিষ্কার। এরই অংশ হিসেবে তারা বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানি সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়ার নীলনকশা তৈরি করে। পাকিস্তানের তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় এসে এক সমাবেশে ঘোষণা দেন; 'উর্দু ও উর্দু হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'। কিন্তু এদেশের ছাত্র-যুবকরা তার এই সাহসী ঘোষণার তীব্র প্রতিবাদ জানায় 'না, না, ওই সমাবেশে হতে পারে না' বলে। পাকিস্তান সরকার নৃশংস শক্তি দিয়ে সমস্ত প্রতিবাদ দমন করার চেষ্টা করেছিল। তাদের বৈষম্যমূলক নীতির বিরুদ্ধে এদেশের মানুষ আপসহীন সংগ্রামে নামে। শুধু বাংলার দামি ছেলেরাই নয়, মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য সর্বস্তরের মানুষ বজ্রকণ্ঠে শপথ নিয়েছেন। ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন বাংলার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্র-যুবকসহ সর্বস্তরের বাঙালিরা এই আন্দোলনের সম্মুখভাগে আসেন। পূর্ব বাংলায় তিন ধাপে আন্দোলন পরিচালিত হয়।

প্রথম পর্যায়: 1947 সালের নভেম্বরে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে একটি শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়

করাচি। সম্মেলনে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত হয়। ফলে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানে বিক্ষোভ শুরু হয়। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে ঢাকায় প্রথম জাতীয় ভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় এবং দাবি আদায়ে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের নীতি গ্রহণ করা হয়। সংগ্রাম পরিষদের দাবি ছিল-১. বাংলা ভাষাই হবে পূর্ব বাংলায় শিক্ষার একমাত্র বাহন এবং অফিস-আদালতের প্রধান মাধ্যম।

2. বাংলা ও উর্দু হবে সমস্ত পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা। এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে আন্দোলন পরিচালিত হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়: 23 ফেব্রুয়ারি 1948 সালে পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে, কংগ্রেস দলের সদস্যরা, বিশেষ করে কুমিল্লার সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, উর্দু ও ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা ভাষা ব্যবহারের দাবি জানান। কিন্তু পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এই দাবির বিরোধিতা করেন। ফলে ঢাকার শিক্ষার্থী ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে চরম অসন্তোষের বিষাক্ত ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ে। এরপর ২৬ ফেব্রুয়ারি সর্বত্র হরতাল পালিত হয়। সংগ্রাম পরিষদ এভাবে ১৫ মার্চ পর্যন্ত ধর্মঘট ও হরতাল পালন করে দেশব্যাপী আন্দোলন অব্যাহত রাখে। এক পর্যায়ে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন বাংলা ভাষার দাবি মেনে নেওয়ার আশ্বাস দিলে আন্দোলন সাময়িকভাবে শান্ত হয়। কিন্তু ১৯৪৮ সালের ১লা মার্চ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ রেসকোর্স ময়দানে এক জনসভায় এবং কার্জন হলে এক সম্মেলনে আবার ঘোষণা করেন, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা'। এই ঘোষণার পর, আন্দোলন আবার চাপ্তা হয় এবং দেশজুড়ে হিংসাত্মক প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যায়।

চূড়ান্ত পর্যায়: ভাষা আন্দোলন 1950 এবং 1952 সালে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে। 1950 সালে, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান আবার ঘোষণা করেন, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।' এতে বাঙালি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং আন্দোলন জোরদার করার অঙ্গীকার করে। ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি খাজা নাজিমুদ্দিন একই ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করেন। ফলে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবীসহ সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে চরম ক্ষোভ ও হতাশা বিরাজ করছে। আন্দোলনের গতি ক্রমেই তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। এই আন্দোলনের অংশ হিসেবে ৩০ জানুয়ারি ঢাকার রাজপথে সর্বাঙ্গিক হরতাল পালিত হয় এবং জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। আন্দোলনকে আরো তীব্র ও গতিশীল করার লক্ষ্যে ৩০ জানুয়ারির জনসভায় 'সর্ব-ইউনিয়ন ভাষা সংগ্রাম কমিটি' গঠন করা হয়। গঠিত কমিটির বৈঠকে ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা দিবস হিসেবে পালন এবং দেশব্যাপী হরতাল পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২১ ফেব্রুয়ারির হরতাল কর্মসূচি বানচাল করতে তৎকালীন গভর্নর নুরুল আমিন সরকার ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করেন। সরকারের এই অপকর্মের দস্তখ্ত জবাব দিতে ২০ ফেব্রুয়ারি রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় ছাত্ররা গোপন বৈঠক করে। যে কোন মূল্যে 144 ধারা লঙ্ঘন করা হবে। পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২১ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে প্রতিবাদ সমাবেশের ডাক দেওয়া হয়। সমাবেশ শেষে মিছিল বের হয়। সেদিন ছাত্রসমাজের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়েছিল স্বাধীনতার দাবিতে। ঢাকার রাজপথ ক্রমেই উত্তাল হয়ে ওঠে। তখন ঢাকায় প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন চলছিল। ভাষার দাবিতে মিছিলটি প্রাদেশিক ভবন অভিমুখে। সেদিন ঢাকায় প্রচুর পুলিশ মোতায়েন ছিল। মিছিলকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালায়। পুলিশের গুলিতে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার একে একে রাস্তায় নেমে পড়েন। সফিউরসহ অন্যান্য যুবক। বুকুর তাজা রক্তে রঞ্জিত ঢাকার অন্ধকার রাস্তা। বাংলার মানুষের রক্তে ভেসে যাওয়া কালি দিয়ে রচিত হয়েছে এক অনন্য ইতিহাস। অবশেষে তীব্র প্রতিবাদের মুখে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয় পাকিস্তান সরকার। সাময়িকভাবে বাংলাকে অন্যতম জাতীয় ভাষা করার প্রস্তাব প্রাদেশিক পরিষদে পেশ করা হয়। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এরপর সাংবিধানিকভাবে 1956 সালে সংবিধানের 214 অনুচ্ছেদে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়। মাতৃভাষা বাংলা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতির চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়।

ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিচে আলোচনা করা হলো।

1. বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ: ভাষা আন্দোলনে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ঐক্য অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে গৃহীত হয়েছিল। ভাষা আন্দোলন প্রমাণ করে বাঙালিরা জাতিগত বাধা নয়। ভাষা আন্দোলনকে তাই বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশের অন্যতম উপাদান বলা যেতে পারে।
2. অধিকার সচেতনতা: ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালিরা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে শেখে। এর মাধ্যমে বাঙালি জাতি অন্যায় অত্যাচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনের কথা জানতে পারে।
3. সংহতি ও ঐক্য: ভাষা আন্দোলন বাঙালির জাতীয় জীবনে সংহতি ও ঐক্যের বোধের জন্ম দেয়। শুধু ছাত্ররাই নয়, কৃষক শ্রমিক বুদ্ধিজীবীরাও এই দলে যোগ দিয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়।
4. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি: হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পেয়েছে ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ব বাংলা। তারা ধর্মনিরপেক্ষ হতে শেখে।
5. রাজনীতিতে মধ্যবিত্তের অংশগ্রহণ: ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমেই পূর্ব বাংলার মধ্যবিত্তের প্রভাবশালী অংশ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে শুরু করে এবং মধ্যবিত্তরা রাজনীতির কেন্দ্রে আসে।
6. শহীদ মিনার স্থাপন: ভাষা আন্দোলনের ফলে শহর ও গ্রামে অসংখ্য শহীদ মিনার স্থাপন করা হয় এবং প্রতি বছর 21শে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস হিসেবে পালিত হয়।
7. স্বাধীনতার অনুপ্রেরণা: ভাষা আন্দোলনের মধ্যে একটি স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টির বীজ নিহিত ছিল এই আন্দোলনের অনুপ্রেরণায় বাঙালিরা একাত্মে মুক্তিযুদ্ধের অনুপ্রেরণা লাভ করে এবং স্বাধীনতা লাভ করে।
8. বাংলা ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি: ভাষা আন্দোলনের ফলে বাংলা ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। 1962 সালের সংবিধানে বাংলা ভাষা বহাল ছিল, ফলে বাংলা ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি: ভাষা আন্দোলন বাঙালির জনচেতনা ও স্বাধীনতা আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। একটি ভাষার জন্য আন্দোলন এবং জীবনদানের মাধ্যমে তা প্রতিষ্ঠা পৃথিবীর ইতিহাসে একটি বিরল দৃষ্টান্ত। পৃথিবীর আর কোনো দেশে মানুষের ভাষার জন্য সংগ্রাম ও রক্ত বিসর্জনের ইতিহাস নেই। তাই ভাষা আন্দোলন বাংলার মানুষের মধ্যে একটি নতুন জাতীয় চেতনা জাগিয়ে তোলে এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি স্থাপন করে। এই আন্দোলনই ধীরে ধীরে বাঙালি জাতিকে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি জাতি যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সূচনা করেছিল তা পরবর্তী আন্দোলনের জন্য আশীর্বাদ বয়ে এনেছিল। 1954 সালের যুক্তফ্রন্টের ঐতিহাসিক বিজয়, 1962 সালের শিক্ষা আন্দোলন, 1966 সালের 6 দফা, 1969 সালের গণঅভ্যুত্থান, 1952 সালের ভাষা আন্দোলন 1970 সালের নির্বাচন এবং 1971 সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের জন্য বিশেষ প্রেরণা যোগায়। এটা অস্বীকার করা যায় না যে ভাষা আন্দোলন পরবর্তী সকল রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত করে। তাই এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও চেতনা এবং ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সফল অনুপ্রেরণা।